ইউনিট ৬

বাংলাদেশের জনসংখ্যা এবং নৃজাতিগোষ্ঠীর পরিচয় ও ভৌগোলিক অবস্থান

পাঠ-১ : জনসংখ্যা কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য: ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত জানবেন;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং
- জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ঘনবসতির দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে তৃতীয়। অপরদিকে জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ধারণা করা হয়, অতীতে এখানে ঘনবসতিপূর্ণ দুইটি অঞ্চল ছিল: তিস্ড়া-করতোয়া অববাহিকা ও ভারতের পশ্চিমবাংলার উত্তর এলাকা এবং বঙ্গীয় সমতলভূমির পূর্বাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় এলাকা জুড়ে বিস্ড়ৃত মেঘনা নদীর নিম্ন উপত্যকা। এ সময় পূর্ববাংলার দক্ষিণ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল অংশে বিক্ষিপ্ত কিছু জনবসতি ছিল, তবে কোথাও কোথাও আদৌ কোনো বসতি ছিল না।

পাল বংশের রাজত্বকালে অধিকাংশ জনগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হিন্দু সেন রাজারা বৌদ্ধ পাল রাজবংশ উৎখাত করে বৌদ্ধদের ওপর ব্যাপক রাজনৈতিক নিপীড়ন চালায়। ফলে অধিকাংশ বৌদ্ধ শরণার্থী হিসেবে বার্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া এবং লাওসে চলে যায়। যার প্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা উলে- খযোগ্য হারে কমে যায়। প্রায় একই সময়ে এ অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ঘটে। একাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে উলে- খযোগ্য সংখ্যক বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী ইসলাম গ্রহণ করে। এই সময়ে পূর্ববাংলার মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ মিলিয়ন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীর দরুণ জনসংখ্যা ৫ থেকে ১০ মিলিয়নে ওঠানামা করে।

ইংরেজ শাসন আমলে পূর্ববাংলায় প্রধানত স্থায়ী গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠে। ঐ সময়ে এই এলাকার জন্মহার ও মৃত্যুহার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই সময় জন্ম ও মৃত্যু হার উভয়ই খুব বেশি ছিল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব কম ছিল। এছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হওয়ার কারণে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের কাঠামোভুক্ত পূর্ববাংলা ৪২ মিলিয়ন জনসংখ্যা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তরাঞ্চলীয় চা বাগানসমৃদ্ধ অঞ্চল ও শিল্পসমৃদ্ধ কলকাতা, হুগলী এলাকার মতো কম ঘনবসতিপূর্ণ এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ (সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনাধিক্য-বিশিষ্ট) ভূখন্ড থেকে পৃথক হয়ে যায়। দেশ বিভাগোত্তর পাক-ভারত বৈরিতা অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত ও শিল্পোন্নত পশ্চিম পাকিস্ড়ানের চেয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে জনমিতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। দেশ বিভাগের পরপরই ধর্মীয় সম্প্রদায়িক দাঙ্গা, খুনাখুনি ও গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটতে থাকলে পরস্পর থেকে প্রায় ২,০০০ কি.মি দূরত্বে আলাদাভাবে অবস্থিত পাকিস্ড়ানের দুটি প্রদেশ (পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান) এবং ভারতের সীমান্ত বরাবর ব্যাপকসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত শৃঙ্খলা পুনর্বহাল করা সম্ভব হয়নি। ফলস্বরূপ জনসংখ্যার ধর্মভিত্তিক আঞ্চলিক বণ্টনে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমিতিক পরিবর্তন দেখা দেয়।

দেশ বিভাগের অল্প কিছুদিন পর ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবন একটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ধর্মের ভিত্তিতে বসতি বিনিময় এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ভারতীয় আদমশুমারীর সূত্রমতে, পূর্ববাংলা থেকে ভারতে ২.৫৫ মিলিয়ন হিন্দু শরণার্থী আশ্রয় নেয়। অপরদিকে পূর্ববাংলায় পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার থেকে আসে ০.৭০ মিলিয়ন শরণার্থী। এক দশকেরও কম সময়ে একটি জনমিতিক বিভক্তিতে রূপ নেয়, এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় জনমিতিক অপূর্ণাঙ্গতা, স্থবিরতা এবং

নির্ধারিত এলাকার বাইরে জনসংখ্যার সম্প্রসারিত না হওয়া। উচ্চ জন্মহার এবং মৃত্যুহারের নিম্নগতি পরবর্তী কয়েক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে প্রতি ১০ বছর পর পর আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ড় ৫টি আদমশুমারী হয়েছে। প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। পরবর্তীতে ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালে আদমশুমারী হয়। নিম্নে বাংলাদেশের আদমশুমারী ও জনসংখ্যা উল্লেখ করা হলো (সারণি-১)।

সারণি-১: বাংলাদেশের আদমশুমারী ও জনসংখ্যা

আদমশুমারী সাল	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (ব.কি.মি)
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮	৪৯৭
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫	৬২৪
১৯৯১	১০.৯৮	২.১৭	৭৫০
২০০১	১২.৯২	১.৪৮	৮৮২
২০১১	১৫.০৬	১.৩৭	১০২১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই-২০১২

এদেশে ২০১১ সালে পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩২.১৪ মিলিয়ন। এর মধ্যে পল-ী এলাকা ও শহর এলাকার পরিবারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯.৪৪ মিলিয়ন এবং ৫.৯২ মিলিয়ন। পরিবারের গড় সদস্যসংখ্যা ৪.৬৮ জন। নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ১০০.৩ : ১০০। ২০১১ সালে উপজাতীয় জনসংখ্যা ছিল ১.৫৮ মিলিয়ন, দেশের মোট জনসংখ্যার ১.০৬%। প্রধান প্রধান উপজাতির মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মণিপুরী, সাঁওতাল, গারো, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা এবং রাখাইন । পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি (মোট উপজাতীয় জনসংখ্যার ১৩.৯%) এবং বান্দরবান (মোট উপজাতীয় জনসংখ্যার ৯.১৫%) জেলায় উপজাতীয় জনসংখ্যা সর্বাধিক সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত। এই দুই জেলায় বসবাসকারী প্রধান উপজাতিসমূহের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চঙ্গ্যা ও রাখাইন। অধিকাংশ মণিপুরী সিলেট জেলায় বাস করে। গারো ও হাজং প্রধান ময়মনসিংহ এলাকায় এবং সাঁওতাল দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় বসবাস করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৮.৩% মুসলিম। ১৯৯১ সালে মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশের সামান্য কিছু বেশি (১০.৫%) ছিল হিন্দু। বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১২%। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে ৫ বছরের কমবয়সী পুরুষ ও মহিলা ছিল যথাক্রমে ১৬.৫% এবং ১৭.০%। ১৫ বছরের কমবয়সী লোকের সংখ্যা ছিল পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই মোট সংখ্যার অর্ধেকের সামান্য কিছু কম। সূচকটি দেশের জনসংখ্যার যুবাবয়সী জনসংখ্যার আধিক্য নির্দেশক। দেশের জনসংখ্যার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রজননক্ষম মহিলাদের আধিক্য (৪২.৩%)। যদিও ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যার অনুপাত এখনও তুলনামূলকভাবে কম (৫.৪%), অদূর ভবিষ্যতে এই অনুপাত জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারার সাথে সঙ্গতি রেখে অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৯১ সালে বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে জনসংখ্যার বিভাজন থেকে দেখা যায় যে, ১০ ও তদুর্ধ্ব বয়সের সকল পুরুষদের মধ্যে কখনও বিয়ে করেনি, সম্প্রতি বিয়ে করেছে এবং কৃতদার, তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত ছিল যথাক্রমে ৪২.১%, ৫৭.২% ও ০.৭%। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে ২৫.২%, ৬৪.৮% ও ১০%। ৩০ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সের প্রায় সব পুরুষই বিবাহিত, মহিলাদের জন্য এই বয়সসীমা ২৫। ১৯৯১ সালে ১৫-১৯ বছর বয়সের মহিলাদের মধ্যে বিবাহিতদের অনুপাত ছিল অনেক বেশি। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১০-১৪ বছর বয়সী মহিলাদের ৩% এবং ১৫-১৯ বছর বয়সী মহিলাদের প্রায় ৫০% ছিল সম্প্রতি বিবাহিত। বাংলাদেশে মহিলাদের মধ্যে যে অধিক সংখ্যায় বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়েছে এটা তারই নির্দেশক। বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত এবং বিচ্ছেদপ্রাপ্তদের অনুপাত মহিলাদের বয়সসীমা বৃদ্ধির সাথে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ১০-১৪ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২% এবং ৬০ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি ৫৬.৩%। ১৯৩১ সালের বিবাহের সময় পুরুষদের গড় বয়স ছিল ১৯ বছর এবং মহিলাদের গড় বয়স ছিল ১২.৬ বছর। বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের গড় বয়সের পার্থক্য ছিল ৬.৪ বছর। ১৯৯১ সালে বিবাহকালীন গড় বয়স পুরুষদের ক্ষেত্রে ছিল ২৫.২ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল ১৮.১ বছর। ১৯৩১-১৯৯১ সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের

বিবাহের সময়ে গড় বয়সের পার্থক্য সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭.১ বছর। ১৯৯৮ সালে বিবাহের সময় পুরুষ ও মহিলাদের গড় বয়স ছিল যথাক্রমে ২৭.৮ বছর এবং ২০.২ বছর।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টনও সর্বত্র সমান নয়। পূর্বে অধিকাংশ মানুষ গ্রাম এলাকায় বসবাস করত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নগরায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হওয়ার কারণে জনসংখ্যার স্থানান্তর ঘটতে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নগরায়ন ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রাম ও শহুরে জনসংখ্যার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশ গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো (সারণি-২)।

সারণি-২ : বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর ভিত্তিক জনসংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো

সাল	গ্রাম (কোটি)	শহর (কোটি)	মোট (কোটি)
১৯৬১	৪.৮২	০.২৬	৫.০৮
১৯৭৪	৬.৯৪	০.৭৯	৭.৬৪
১৯৮১	৭.০৮	১.২০	৯.০০
১৯৯১	৮.৯০	২.২৪	১১.১৪
২০০১	৯.৪৩	২.৮৮	১২.৩১
২০১১	১১.১৬	৩.৯৮	১৫.১৪

উৎস: মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন ,জুন-২০১৩, বিবিএস

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যা ১৫.০৬ কোটি এবং বৃদ্ধিও হার ১.৩৭%। অতীতকালে এখানে নদীভিত্তিক জনবসতি গড়ে ওঠেছিল। কালক্রমে এর বিস্তৃতি ঘটেছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী জনগণের আবাস হিসেবে এ এলাকা গড়ে ওঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যার উলে-খযোগ্য বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের গড় আয়ুসহ সার্বিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটাওে ৪৯৭ জন এবং ২০১১ সালে তা দাঁড়ায় ১০২১ জনে। গ্রামীণ এবং শহুরে জনসংখ্যার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায়। শহুওে জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৬.১

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. একাদশ ও দ্বাদশ শতকে জনসংখ্যা হ্রাস পায় কেন?
২. বাংলাদেশে এ পর্যন্ড় কতটি আদমশুমারী হয়েছে এবং কত সালে?
৩. বাংলাদেশের গ্রাম ও শহুরে জনসংখ্যার চিত্র তুলে ধরুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সর্ম্পকে আলোকপাত করুন।
২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : বাংলাদেশের অধিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ও তাদের সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- বাংলাদেশের অধিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস সর্ম্পকে জানবেন এবং
- অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক পরিচয় বলতে পারবেন।

তথ্যগত স্বল্পতার কারণে মুসলিম-পূর্বযুগের বাংলার ইতিহাস সঠিকভাবে জানা যায় না। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বাংলায় শাসনামলে বৈদিক, মহাকাব্যিক, পৌরাণিক সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির ওপর ভিত্তি করে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস বিনির্মাণ করা যায়। সর্বপ্রাচীন যুগে বাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তৎকালীন সময়ে অঞ্চলের নামের সাথে জনগোষ্ঠীর নাম সম্পৃক্ত হয়ে যেত। যার ফলে বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ় ও গৌড়-নামক প্রাচীন জনপদসমূহ স্ব স্ব নামের অনার্য জনগোষ্ঠী দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশে অনার্য জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে সমতট ও হরিকেলের নাম জানা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর্য প্রভাব অনুভূত হয়। তবে উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছতে আর্যদের আরো বেশি সময় লেগে যায়। যার ফলে বাংলার অধিবাসী আর্যদের ধারা বেশ দেরিতেই উপলব্ধি করে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হতে শুরু করে সমগ্র বাংলাকে আর্যায়িত করতে প্রায় এক হাজার বছর সময় লেগে যায়। কিন্তু এর পূর্বেই বাংলার

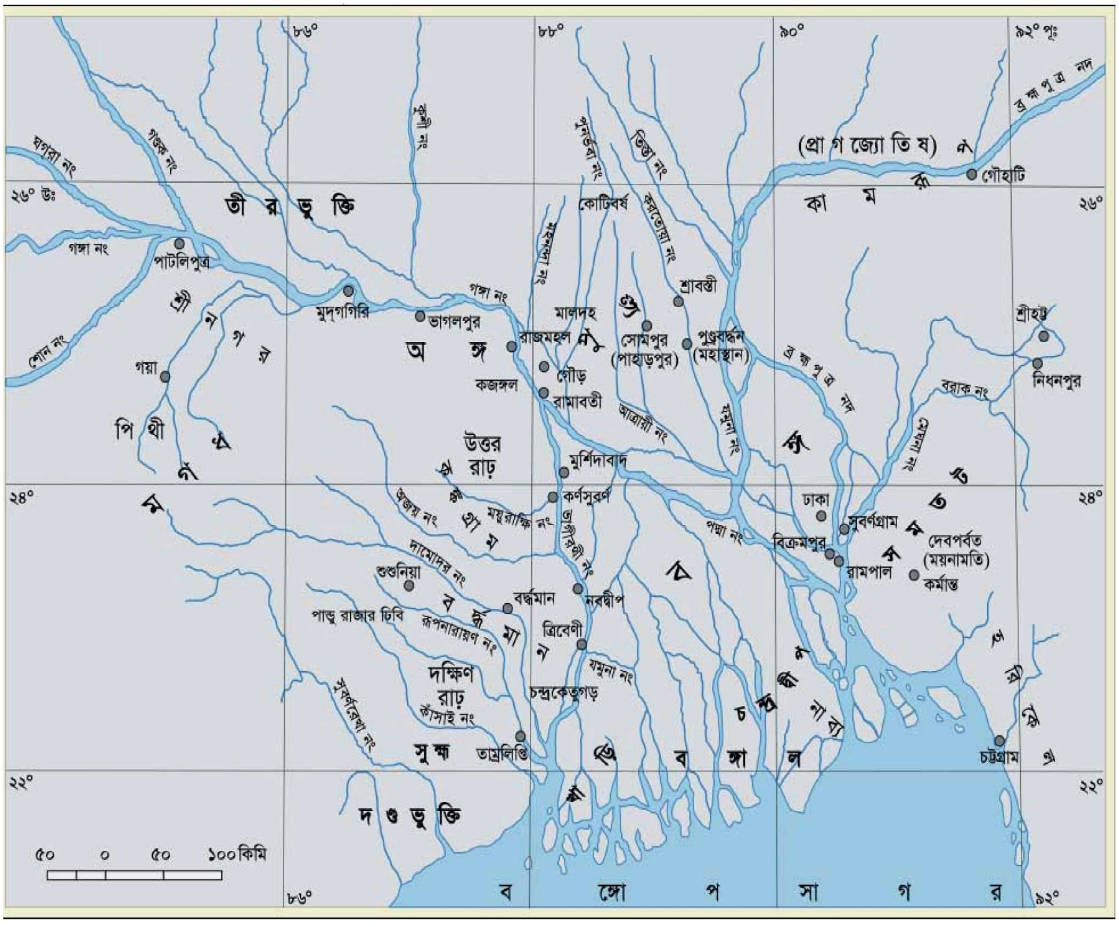

চিত্র : বাংলা (প্রাচীন যুগ)

অধিবাসীদের সংস্কৃতিতে অনার্য উপাদান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আর্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অনার্য বৈশিষ্ট্যই বেশি বজায় থাকে।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হল হাতিয়ার। এই সব হাতিয়ার পাথরের তৈরি হত। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর বাকুড়া ও বর্ধমান জেলায় আনুমানিক দশ হাজার বছর আগের ব্যবহৃত পাথরের তৈরি হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিষাদ বা অস্ট্রিক অথবা অস্ট্রো এশীয় গোষ্ঠীর অনার্য অধিবাসীরাই এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আজকের কোল, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। দ্রাবিড় ও তিব্বতি বর্মি ভাষার আরো দুটি জাতি পরবর্তীকালে বাংলায় বসতি স্থাপন করে। তবে বাংলার কোথাও কোথাও খ্রিষ্ঠপূর্ব প্রথম শতকের শুরুতে বা তারও আগে অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। অজয় নদের উপত্যকায় বর্ধমান জেলার পান্ডু রাজার ঢিবি এবং অজয় কুনার ও কোপাই নদীর তীরবর্তী অন্যান্য এলাকায় প্রাপ্ত নিদর্শনাদি বাংলায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে নতুন ধারণা দেয়।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু জনবহুল রাষ্ট্র। জনসংখ্যার অধিকাংশ বাঙ্গালি হলেও অনেকগুলো উপজাতি গোত্রও রয়েছে। বাংলাদেশের উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৮,৯৭,৮২৮জন যা সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক শতাংশ। বাংলাদেশের উপজাতি জনগোষ্ঠী সিংহভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের সর্ববহৃৎ উপজাতি গোষ্ঠী হল চাকমা। উপজাতি বা নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহ হচ্ছেঃ মগ, মুরং, মারমা, ত্রিপুরা, হাজং ইত্যাদি। বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানে রয়েছে চাকমা উপজাতির লোকজন। মূলত ১৬০০ সালের পর থেকে তারা এদেশে আসতে শুরু করে। একেক উপজাতির জন্য এই দেশে আগমনের কারণ ছিল একেক রকম। কেউ বিতারিত হয়ে, কেউ প্রাণের ভয়ে, কেউ বা শুধুমাত্র শখের বসে এদেশে এসে বসবাস করছে।

উপজাতিরা বেশির ভাগ আমাদের দেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে। কারণ তারা মায়ানমার, ভূটান, নেপাল, ভারত ও চীন থেকে এই দেশে এসে বসবাস শুরু করেছে।

আদিবাসী

কোন এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন জনবসতি ও তাদের সংস্কৃতিকে বোঝাতে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক জনগোষ্ঠীর জৈব ও সামাজিক প্রভাবজাত নয় এমন জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলা হয়।

উপজাতি

উপজাতি বলতে এমন জনগোষ্ঠীগুলোকে বুঝায় যা আলাদা রাষ্ট্র গঠণ করতে পারেনি কিন্তু নিজের একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতি বা উপজাতি নির্দিষ্টকরণ হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের আদিবাসী হল বাঙ্গালিরা যারা বাংলাদেশে সবার আগে থেকে বসবাস করছে। আগে এদেশের সভ্যতাকে অনেকেই অবার্চিন বলে মনে করলেও বঙ্গদেশে চার হাজারের বেশি প্রাচীন তাম্রাশ্ম (Chalcolithic) যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে যেখানে দ্রাবিড়, তিব্বতি-বর্মী ও অস্ট্রো-এশীয় নর সম্প্রদায়ের বাস ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। বঙ্গ বা বাংলা শব্দটির সঠিক ব্যুৎপত্তি জানা না গেলেও অনেকে মনে করেন এই নামটি এসে থাকতে পারে দ্রাবিড় ভাষী রং নামক একটি গোষ্ঠী থেকে যারা এই অঞ্চলে আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বসবাস করত। ড. অতুল সুরের মতে, 'বয়াংসি' অর্থাৎ পক্ষী এদের টোটেম ছিল। উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রায় পুরাতাত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছিলো প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। ধারণা করা হয়, দ্রাবিড় ও তিব্বতীয়-বর্মী জনগোষ্ঠী এখানে যেসময় বসতি স্থাপন করেছিল, বাংলাদেশে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর অবস্থান উপজাতিদের আগমনের অনেক আগে থেকেই। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতিগুলো আলোচনা করা হলোঃ

গারোঃ ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় ও বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায় গারো নামে পরিচিত। ভারতের মেঘালয় ছাড়াও আসামের কামরুপ, গোয়ালপাড়া ও কারবি আংলং জেলায় এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ছাড়াও টাঙ্গাইল, সিলেট, শেরপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, ঢাকা ও গাজীপুর জেলায় গারোরা বাস করে।

গারোরা ভাষা অনুযায়ী বোড়ো মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক গারোই নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেন। গারোদের ভাষায় মান্দি শব্দের অর্থ হল মানুষ। গারোদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত। তাদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম ওয়ানগালা; যাতে দেবতা মিসি আর সালজং এর উদ্দেশ্যে উৎপাদিত ফসল উৎসর্গ করা হয়। উলে- খ্য, ওয়ানগালা না হওয়া পর্যন্ত মান্দিরা নতুন উৎপাদিত ফসলাদি খেত না। আশ্বিন মাসে একেক গ্রামের মানুষদের সামর্থ্যানুযায়ী সাত দিন কিংবা তিনদিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। অতীতে গারোরা সবাই তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করত। তাদের আদি ধর্মের নাম সংস্রেক। ১৮৬২ সালে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর থেকে বর্তমানে

প্রায় ৯৮ ভাগ গারো খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তাদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠানে বেশ পরিবর্তন এসেছে।

গারোদের প্রধান দেবতার নাম তাতারা রাবুগা। এছাড়াও অন্যান্য দেবতারা হলেন- মিসি সালজং, সুসমি, গয়ড়া প্রমুখ। বিভিন্ন গবেষকগণ বিভিন্ন সময়ে গবেষণা করে এ পর্যন্ড় বেশ কয়েকটি গারো বর্ণমালা আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো উচ্চ গবেষণার জন্য বিরিশিরি কালচারাল একাডেমীতে সংরক্ষণ করা আছে।

চাকমা: চাকমা সম্প্রদায় দেশের রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করে। চাকমারা মঙ্গোলীয় জাতির একটি শাখা এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধপূর্ণিমা ছাড়া তাদের অন্যতম প্রধান আনন্দ উৎসব হচ্ছে বিজু। তাদের প্রধান জীবিকা কৃষি কাজ। জুম চাষের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও রবিশস্য উৎপাদন করে থাকে।

চাকমাদের উৎপত্তিকাল, আদি নিবাস ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাদের আগমন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ষোড়শ শতকের আগের কোনো সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়নি। তবে এ পর্যন্ড় প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিশ্চিত বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের বসবাসের নজির আছে। ১৫৬১ সালে ইউরোপীয়দের আঁকা ছবি থেকে বাংলার যে মানচিত্র পাওয়া যায় সেখানেও চাকমাদের অবস্থানের প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল তৈন বা আলেখ্যাং ডং। সময়ের পরিক্রমায় চাকমা রাজতন্ত্রে নানা উত্থান-পতন ও বর্মা-মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে চাকমাদের আবাসস্থল এবং রাজ্য শঙ্খ নদীর তীরবর্তী হাঙ্গরকুল ও চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া হয়ে উত্তর-পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ব্যাপ্ত হয়।

চাকমাদের ভাষার নামও চাকমা। চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। চাকমারা ৪৬টি গোজা ও বিভিন্ন গুথি বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। চাকমারা আদি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তারা বৌদ্ধ হলেও কেউ কেউ আবার প্রকৃতি পূজারীও। চাকমারা জন্মান্ড়রবাদে বিশ্বাস করি। ক্রমাগত সৎকর্ম সাধনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস করে তারা। নিম্নে বিভাগভিত্তিক উপজাতি লোকসংখ্যা দেখানো হলো (সারণি-১)।

সারণি-১: বিভাগভিত্তিক উপজাতি জনসংখ্যা

বিভাগ	উপজাতি জনসংখ্যা
বরিশাল	২,৭৫৭
চট্টগ্রাম	৮,৯৭,৮৭১
ঢাকা	১,৪৯,০০৭
খুলনা	৪০,৫৩০
রাজশাহী	২,৪৫,০১৫
রংপুর	১,০২,০০১
সিলেট	১,৪৮,৯৬০
মোট	১৫,৮৬,১৪১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক- ২০১২

মুরং মুরং বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। মুরুং শব্দটি বহুবচন যার একবচন হল ম্রো'। ম্রো' শব্দের অর্থ মানুষ। ম্রো ভাষায় 'ম্রো'রা নিজেদের 'মারুচা' বলে থাকে। মুরুংদের ভাষা মৌখিক।

সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে মুরুং উপজাতিরা আরাকান থেকে পালিয়ে আলীকদমের বিভিন্ন পাহাড়ী উপত্যকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তবে বার্মার আকিয়াব জেলায় এখনো মুরুং উপজাতীয় বসতি বিদ্যমান বলে জানা যায়। উপজেলা সদর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে চিওনী পাড়া ও আমতলী এলাকায় এ সম্প্রদায়ের ২টি পাড়া রয়েছে। তাছাড়া প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলাকা তৈন মৌজা, মাংগু মৌজা, চাইপ্রা মৌজা, তৈনফা মৌজা এবং তৈন খাল এলাকা ও মাতামুহুরী সন্নিহিত পাহাড়ী এলাকায় তাদের বসতি রয়েছে। তবে মাতামুহুরী নদী তীরবর্তী ও পাহাড়ে তাদের বসবাস উলে-খ্যযোগ্য পরিমাণে। মুরুং সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। মুরুংদের একটি অংশ আলীকদমের প্রত্যন্ড় পাহাড়ী এলাকায় "কিম" ঘর তৈরি করে বসতি স্থাপন করেন। তারা ঘরে জীবজন্তুর মাথা জুলিয়ে রেখে থাকে। তাদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র রয়েছে; এর মধ্যে- ঙারুয়া, প্রেঞ্জু, জালা, কানবক, নাইজাহ, তাং, দেং প্রভৃতি। প্রত্যেক পাড়ায় তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজনকে 'কার্বারী' নিযুক্ত করা হয়। মুরুং নারী-পুরুষ কঠোর পরিশ্রমী বলে এদের স্বাস্থ্য সুঠাম। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও পাহাড়ী জুমচাষে সমান পারদর্শী।

মুরংরা অত্যন্ত স্বল্পবসন পরিধান করে। মেয়েরা 'ওয়াংকাই' নামে এক ধরনের ছোট পরিধেয় ব্যবহার করে। যা নাভীর নীচ থেকে হাঁটুর উপরিভাগ পর্যন্ত পড়ে থাকে। এটি ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়ামাত্র। মেয়েরা পায়ে "কক ক্যান" (নুপুর) কোমরে "রকম" (বিছা) পড়ে থাকে। পুরুষগণ 'ডং' (লেংটি-বিদ্রি) নামে এক ধরনের কিঞ্চিতকর বস্ত্র পরিধান করে। মুরুং মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও মাথায় লম্বা চুল রাখে। নারী-পুরুষরা মাথায় অধিকন্তু "চুরুত" (চিরুনী) গেঁথে রাখতে দেখা যায়। মুরুং মেয়েরা মাথায়, কানে ও খোঁপায় বিভিন্ন ধরনের "পাও" (পাহাড়ী ফুল) গুজে রাখে। ছেলেরাও মাথার চুলকে খোপা আকারে বেঁধে রাখে। মুরংরা দাঁতের মধ্যে এক ধরনের রংয়ের প্রলেপ দিয়ে থাকে। লোহাকে উত্তপ্ত করে কাঁচা বাঁশের সাথে লাগিয়ে নির্গত রসকে দাঁতে লাগিয়ে দেয়। মুরুং সম্প্রদায়ের ছেলে একই গোত্রের কোন মেয়েকে বিবাহ করতে পারেনা। মুরুং সমাজে তিন পদ্ধতিতে বিবাহ হয়ে থাকে। রীতি অনুযায়ী মুরুং ছেলে কন্যার দেহের মূল্য বাবদ রৌপ্য মুদ্রায় একশত দশ টাকা, মায়ের দুধের দাম বাবদ দশ টাকা প্রদান করতে হয়। এসব রৌপ্য টাকা অবশ্য পরিশোধনীয় বলে গণ্য করা হয়। একই গোত্রের মধ্যে ধর্মীয়ভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ। মুরুং দম্পতির মধ্যেও মনের মিল না থাকলে তালাক প্রথা বিদ্যমান রয়েছে।

মুরুং নৃত্যের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা গালে, ঠোঁটে ও কপালে রংয়ের প্রলেপ লাগায়। নৃত্যের আগে ১৫ থেকে ২০ জন মুরুং যুবক-যুবতী মুখোমুখী দাড়িয়ে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি রচনা করে। এরপর তাদের তৈরি বাঁশীর সুর ও বাজনার তালে তালে নৃত্য পরিবেশ করে থাকে। নাচে ও গানে বিবাহিত মেয়েদের অংশ নিতে দেয়া হয় না। মুরুং সম্প্রদায় নিজেরাই "পুং" নামের একটি বাঁশী তৈরি করে। পাহাড়ে উৎপন্ন "বুদুম" (এক ধরনের পাহাড়ী লাউ) এর শুকনো খোলের সাথে ৫/৬ বা ততোধিক "কাও" (বাঁশের কঞ্চি) এর টুকরা দিয়ে এ বাঁশীটি তৈরি করা হয়।

মুরুং সম্প্রদায় মূলত প্রকৃতি পুজারী। তারা ইহকালকেই স্বর্বস্ব জ্ঞান করেন। তাদের মতে, পরকাল বলতে কিছুই নেই। মুরুংদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ সম্বলিত কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। তাদের ধর্মবিশ্বাসে আকীর্ণ প্রধান উৎসবের নাম হলো "চিয়া-চট-প্লাই" অর্থাৎ গো-হত্যা উৎসব। গো-হত্যাকে ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসাবেই পালন করা হয়। প্রতিবছর জুমের ফসল ঘরে তোলার আগে মুরুং সম্প্রদায় মহা ধুম-ধামের সাথে এ উৎসব করে। এছাড়া এ সম্প্রদায়ের পরিবারে কারো অসুখ-বিসুখ হলে তারা রোগ বালাই থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে 'চিয়া-চট-প্লাই' পালনের মানত করে থাকে। তারা "চাম্পুয়া" নামের অপর একটি উৎসব পালন করে থাকে। সৃষ্টিকর্তা তাদের ধর্মীয় বিধান কলাপাতায় লিপিবদ্ধ করেছিল এ বিশ্বাসে তারা কলাপাতা কেটে এই উৎসব করে থাকে। এ সম্প্রদায়ের অনেকে আবার "ক্রামা" নামের অপর একটি ধর্মমতেও বিশ্বাস করে থাকে। মুরুং সম্প্রদায়ের কোন লোকের মৃত্যু হলে মৃতদেহ সপ্তাহ পর্যন্ড় ঘরের মধ্যে রাখা হয়। মৃত ব্যক্তির পাশে শুকর, ছাগল ও মোরগ জবাই করে পরিবেশন করা হয়। মৃতকে নদী তীরবর্তী চিতায় দাহ করার আগ পর্যন্ত গান-বাজনা ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে উল-াস করা হয়।

সাঁওতাল: সাঁওতালরা পূর্ব-ভারত ও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠীগুলির একটি। সাঁওতালরা সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে। এ ভাষাটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সাঁওতালরা বাংলাদেশের অন্য অনেক উপজাতির মত মঙ্গোলীয় গোত্রের নয়। সাঁওতালদের মধ্যম গড়নের আকৃতি, শরীরের গাঢ় রঙ, চ্যাপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট এবং কোঁকড়ানো চুল তাদের অস্ট্রো-এশিয়াটিক নৃতাত্ত্বিক উৎস নির্দেশ করে।

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অধিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নামে বিভিন্ন জনপদ গড়ে উঠেছে। যেমন- পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ ইত্যাদি। মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন হাতিয়ারের প্রচলন এ অঞ্চলে ছিল। এদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপজাতি আবাস গড়ে তুলে। এসকল জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য। যা দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে তাদের স্বাতন্ত্র দান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৬.২

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. আদিবাসী এবং উপজাতি বলতে কি বুঝায়?
২. মুরংদের ধর্ম বিশ্বাস সর্ম্পকে লিখুন।
৩. সাঁওতালদের গঠন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অধিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. চাকমা এবং গারোদের জীবন ব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিবর্তন সর্ম্পকে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা সর্ম্পকে বলতে পারবেন;
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে জানবেন;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ জানবেন এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ জানবেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতি অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম এবং মুসলিম বিশ্বে তৃতীয়। ২০০১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২.৯২ কোটি যা ২০১১ সালে ১৫.০৬ কোটিতে দাঁড়ায়। এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারও অতি উচ্চ। অধিক জনসংখ্যার কারণে উন্নয়ন যাত্রা প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে। দক্ষতা, প্রযুক্তি ও শিক্ষার অভাবে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলছে। জনসংখ্যা আজ দেশের সম্পদে পরিণত না হয়ে চাপে পরিণত হয়েছে। বিশ শতকের শুরু থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা নিম্নরূপ (সারণি-১)।

সারণি-১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯০১	২.৮৯	---
১৯১১	৩.১৫	০.৮৭
১৯২১	৩.৩২	০.৫২
১৯৩১	৩.৫৬	০.৬৮
১৯৪১	৪.১৯	১.৬৫
১৯৫১	৪.৪৯	০.৫০
১৯৬১	৫.৫২	২.২৬
১৯৭১	৭.৯৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯৯১	১০.৯৮	২.০৩
২০০১	১২.৯২	১.৪৮
২০১১	১৫.০৬	১.৩৭

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক- ২০১২

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব: ব্রিটিশ ধর্মযাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ On Principle of Population-এ জনসংখ্যা বিষয়ক একটি তত্ত্ব দেন যা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (Geometric Progression) যেমন- ১, ২, ৪, ৮, ১৬... এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (Arithmatic Progression) যেমন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬...। প্রতি ২৫ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুন হয় কিন্তু খাদ্য উৎপাদন সে সময় খুব সামান্যই বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খাদ্য উৎপাদনের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় জনসংখ্যা। ফলে সে দেশ জনবহুল দেশে পরিণত হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, হানাহানি, লুণ্ঠন, যুদ্ধ, বন্যা, খরা ইত্যাদি দেখা দেয়। ম্যালথাস এগুলোকে প্রকৃতির বিধান বলে অভিহিত করেছেন যা স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হবে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ:

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. **জলবায়ু:** কোন দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিতে সেখানকার জলবায়ু সহায়তা করে। বাংলাদেশের জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মহিলারা শীতপ্রধান দেশের মহিলাদের তুলনায় কম বয়সে সন্তান ধারণের ক্ষমতা অর্জন করে। এ কারণে আমাদের দেশে জন্মহার বেশি।

২. **মৃত্যু হার হ্রাস:** সরকারের সচেতনতামূলক কর্মকান্ড এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে দেশে মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মাতৃ-মৃত্যু ও শিশুমৃত্যু রোধে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে।

৩. **উচ্চ জন্মহার:** নানাবিধ কারণে দেশে জন্মহার অতি উচ্চ। বিশেষ করে অশিক্ষা, কুসংস্কার , জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি কারণে জন্মহার বেশি হয়ে থাকে। ফলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি:** চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৪.৭২ বছর এবং ২০১১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬৭.৪ বছর। পূর্বে চিকিৎসা, দারিদ্র্য, অধিক শিশু মৃত্যুহারের কারণে মৃত্যুহার বেশি ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশের কয়েক দশকের মানুষের গড় আয়ু দেখানো হলো (সারণি-২)।

সারণি-২: বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু (বিভিন্ন দশক)

সাল	পুরুষের গড় আয়ু (বছর)	মহিলাদের গড় আয়ু (বছর)	গড় (বছর)
১৯৬১	৪৪.২২	৪৫.২২	৪৪.৭২
১৯৭৪	৪৬.০০	৪৭.০০	৪৬.৫০
১৯৮১	৫৫.০০	৫৪.০০	৫৪.৫০
১৯৯১	৫৬.৪০	৫৫.৪০	৫৫.৯০
২০০১	৬১.০০	৬১.০০	৬১.০০
২০১১	৬৬.১০	৬৮.৭	৬৭.৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১২

৫. **অভিগমন:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অভিগমনেরও একটি ভূমিকা রয়েছে। এটি সব সময় পরিলক্ষিত হয়না। তবে বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক: বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামকসমূহ নিম্নরূপ:

১. **শিক্ষার অভাব:** শিক্ষার অভাবে দেশের জনগণ অধিক জনসংখ্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানেনা এবং সচেতন নয়। ফলে সন্তানদের শিক্ষা, পুষ্টি, ভরণপোষণ প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে সন্তান জন্মদান করতে পারাকেই বৈবাহিক মূল দায়িত্ব হিসেবে মনে করে।

২. **বাল্যবিবাহ:** কুসংস্কার, ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যাখ্যা, দরিদ্রতা ইত্যাদি কারণে দেশে বাল্যবিবাহের হার বেশি যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. **জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ধারণা:** দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত না হওয়ায় জন্ম নিয়ন্ত্রণে তেমন আগ্রহী হয় না। তাছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক ভয়ের কারণে অনেক দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণ হতে বিরত থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হয়।

৪. **কাঙ্খিত সন্তান:** অনেক সময় পুত্র বা কন্যা সন্তানের জন্য অনেকে বারবার সন্তান গ্রহণ করে। উদাহরনস্বরূপ, যে ব্যক্তির পরপর দুটি ছেলে বা মেয়ে হয়েছে, সে ব্যক্তি তখন বিপরীত লিঙ্গের সন্তানের জন্য আবারও সন্তান গ্রহণ করে। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম নিয়ামক।

৫. **উপার্জন:** অনেক সময় দরিদ্র বাবা-মা সংসারের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে উৎসাহিত বোধ করে। সন্তান বেশি হলে বড় হয়ে অধিক উপার্জন করবে যা পরিবারের সহায়ক হবে।

৬. **খাদ্যাভাস:** খাদ্যাভাস দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, বেশি বেশি শ্বেতসার জাতীয় খাবার মানুষের প্রজনন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের মানুষ ভাত, আলু, গম ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাবার বেশি খায় বলে তাদের প্রজনন ক্ষমতা উচ্চ হয়ে থাকে।

৭. **জলবায়ু:** জনবায়ুগত কারণে এখানকার মেয়েদের সন্তান ধারণের ক্ষমতা বেশি হয়ে থাকে যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৮. **চিত্তবিনোদনের অভাব:** আমাদের দেশে চিত্তবিনোদনের তেমন কোন সুযোগ নেই। শহর কিংবা গ্রাম উভয় জায়গাতে দিন দিন বিনোদনের স্থান সংকুচিত হয়ে গেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনকেই চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

৯. **বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তাঃ** আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে তেমন উল্লেখযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা না থাকা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক। বেশি সন্তান হলে কোনো না কোনো সন্তান বাবা-মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এজন্য বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্তে থাকার জন্য অনেকেই বেশি বেশি সন্তান গ্রহণ করে থাকে।

১০. **সামাজিক শক্তি বৃদ্ধিঃ** অনেক সময় গ্রাম্য এলাকায় বেশি শক্তি দেখানোর জন্য অনেকেই বেশি সন্তান নিয়ে থাকে। পূর্বে এ প্রবনতা খুব বেশি ছিল। পরিবারের অধিক সন্তান থাকাকে অনেকে সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবেও বিবেচনা করে। ফলে অধিক সন্তান নিতে তারা উৎসাহিত হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

একটি রাষ্ট্রের জন্য জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিভিন্ন কারণে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। জলবায়ু, মৃত্যুহার হ্রাস, উচ্চ জন্মহার, গড় আয়ু বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ামক হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ১৯৬১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫.৫২ কোটি যা ২০১১ সালে এসে ১৫.০৬ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন না বাড়লে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, হানাহানি, লুণ্ঠন, যুদ্ধ, বন্যা, খরা ইত্যাদি দেখা দেয়। তাই একটি দেশের জনসংখ্যা সেদেশের আকার অনুযায়ী হওয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৬.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটির মূল বক্তব্য উল্লেখ করুন?
২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ কি?
৩. খাদ্যাভাস কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা এবং নিয়ামক সমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৪ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ পড়ে আপনি-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট প্রভাব সর্ম্পকে বলতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় সর্ম্পকে জানবেন।

একটি দেশের জনসংখ্যা তার আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সম্পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র ভিন্ন। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটারে বাস করছে প্রায় ১৫.০৬ কোটি লোক। প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে ১০২১ জন। এই জনগোষ্ঠীর বন্টনও সমভাবে বন্টিত নয়। ফলে সার্বিকভাবে তা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলছে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব: অধিক জনসংখ্যা নানাভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। সর্বোপরি তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। অধিক জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

১. **কৃষি জমি হ্রাস:** দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ০.০০১৮ হেক্টর। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দেশের আয়তন বাড়ছে না। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবকাঠামো নির্মাণে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির বিভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমি খন্ড-বিখন্ড হচ্ছে। এতে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

২. **চাকরির অভাব:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে চাকুরিতে পদ বাড়ছে না। এতে দেশে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ফলে সামাজিক অস্থিশীলতার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. **মাথাপিছু আয় হ্রাস:** জনসংখ্যা যত বাড়ছে মাথাপিছু আয় তত কমছে। আর এতে করে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বাড়ছে এবং জীবনযাত্রার মানও কমছে।

৪. **পুষ্টিহীনতা:** বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার সংস্থান করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এতে শিশু অবস্থা থেকে অনেকেই অপুষ্টির শিকার হয়। ফলে একটি দক্ষ জনশক্তি হিসেবে অধিকাংশ শিশু বাড়তে পারে না এবং অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হয়।

৫. **খাদ্যাভাব:** জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান দেশীয় উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা দূরুহ হয়ে পড়ছে। ফলে প্রতি বছর প্রচুর খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে।

৬. **বাসস্থানের অভাব:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাসিক সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত ভূমির প্রয়োজন হয়। ফলে বাসস্থানের সংস্থান করতে গিয়ে কৃষি ও বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া শহরে বিপুল সংখ্যক লোক বস্ড়ি এলাকায় ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করে।

৭. **সুপেয় পানি সরবরাহ:** জীবনধারনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান পানি। উপকূলীয় অঞ্চলের লবনাক্ত পানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিকযুক্ত পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্ড়র নিচে নেমে যাওয়া, নগর এলাকায় জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ থাকায় বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

৮. **পরিবহন সমস্যা বৃদ্ধি:** অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের পরিবহন ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। দেশের প্রধান কয়েকটি পরিবহন মাধ্যম যেমন- ট্রেন, বাস, লঞ্চ ইত্যাদিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এছাড়া বিভিন্ন নগর এলাকা বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এর প্রভাব অত্যধিক। ঢাকা শহরে অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজপথে যানজট লেগেই থাকে।

৯. **মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া:** জনসংখ্যা এবং সম্পদের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকার কারণে রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমসিম খাচ্ছে। খাদ্য, বাসস্থান, সুপেয় পানি ছাড়াও বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যার কারণে সবাই সমান সুযোগ পাচ্ছে না।

১০. **দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৩১.৫০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রের উর্দ্ধসীমায় বাস করছে। এর মধ্যে পল্লী এলাকায় ৩৫.২০% এবং শহরে ২১.২০%। আর দারিদ্রের নিম্নসীমায় বাস করছে ১৭.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে পল্লী এলাকায় ২১.১% এবং শহরে ৭.৭০%। সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র সীমার উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। গ্রাম এলাকায় এটি বেশি পরিলক্ষিত হবে। যা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।

১১. **শিক্ষার গুনগত মান হ্রাস:** অতিরিক্ত জনসংখ্যা হলে তাদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন। দেশের শিক্ষা গ্রহনকারী সংখ্যা অধিক হওয়ায় একই শ্রেণীকক্ষে এবং স্বল্প শিক্ষক দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিতে হয়। এছাড়াও যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে শিক্ষার গুনগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১২. **নিম্ন জীবনযাত্রার মান:** পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে তাদের চাহিদা পূরণ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সীমিত আয় দিয়েই পরিবারের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করতে হয়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাঙ্খিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে না।

১৩. **অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি:** কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে অনেককে অলস সময় অতিবাহিত করতে হয়। এতে বিভিন্ন অপচিন্ড়ায় জড়িয়ে পড়ে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

১৪. **শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত:** দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী মৌলিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ পুঁজি ব্যয় করতে হয়। ফলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়।

১৫. **কাঁচামাল উৎপাদন ব্যাহত:** বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম প্রধান উৎস কৃষি উৎপাদিত পণ্য। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাসস্থানসহ বিভিন্ন প্রকার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কৃষিযোগ্য ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

১৬. **মুদ্রাস্ফীতি:** জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধির ফলে চাহিদাও দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কিন্তু উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না। আর উৎপাদন একই হারে না বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত মুদ্রার প্রচলন হচ্ছে। এতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে যা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে।

১৭. **নির্ভরশীলতা:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থের সংকট দেখা দেয়। জনগণ তাদের চাহিদা পূরণ করতে হিমশিম খাওয়ায় সরকারকে অধিক কর দিতে পারে না। এতে সরকারের আয় কমে যাওয়ায় বাজেটের অর্থ সংকুলান করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সরকারকে বিভিন্নভাবে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এতে রাষ্ট্র আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া প্রলম্বিত হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে করণীয়: জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে পদক্ষেপের কোন বিকল্প নেই। নিম্নে তার কতিপয় পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

১. **শিক্ষা বিস্তার:** শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, কুসংস্কার থেকে দূরে রাখে। যদি জনগণকে শিক্ষিত করা যায় তাহলে তারা অধিক জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে পূর্বেই বুঝতে পারবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে।

২. **ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করা:** সন্তান জন্মদানের বিষয়টি অনেক সময় ধর্মের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মসজিদ, মন্দির, গির্জার মাধ্যমে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারা তাদের কম সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে।

৩. **জন্মনিয়ন্ত্রণ:** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই। কারণ জনসংখ্যা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করলে তা নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই একমাত্র উপায়। সত্তরের দশকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার ছিল ৭.৩ শতাংশ যা ২০১১ সালে এসে দাঁড়ায় ৬১ শতাংশে। এই হার দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এখনও জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে বিরত রয়েছে। তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সহজলভ্য করা অত্যন্ত জরুরি।

৪. **বাল্যবিবাহ রোধ:** আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এবং শহুরে বস্তি এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রচলন অধিকাংশ লোকের মাঝে দেখা যায়। অনেক অভিভাবকের ধারণা, ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলেই তারা নিশ্চিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাটি বেশি দেখা যায়। তাই জনগোষ্ঠীর এই অংশটিকে বাল্যবিবাহের কুফল সর্ম্পকে সচেতন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে।

৫. **বিলম্বে বিবাহে উৎসাহ প্রদান:** দেশে ১৯৬১ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৪.৭২ বছর যা ২০১১ সালে এসে দাঁড়ায় ৬৭.৪ বছর। এর মধ্যে মহিলাদের গড় আয়ু ৬৮.৭ বছর এবং পুরুষদের গড় আয়ু ৬৬.১ বছর। যেহেতু দেশের মানুষের গড় আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু বিলম্বে বিবাহে উৎসাহিত করতে হবে। এতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট অগ্রগতি হবে।

৬. **জনসংখ্যার সুষম বণ্টন:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত হয়। কোনো স্থানে জনসংখ্যা অত্যন্ত নিবিড় আবার কোনো স্থানে বিরল। তাই যেসব এলাকা জনবিরল সেসব এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনসংখ্যা আকৃষ্ট করতে পারলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৭. **আয়ের সুষম বন্টন:** দেশের জাতীয় আয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে যেন আটকে না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হবে। তাই আয়ের সুষম বন্টনে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৮. **চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি:** শিশু মৃত্যু হার অধিক হলে পিতা-মাতা অধিক সন্তান কামনা করে। এজন্য শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে অভিভাবকগণ একটি বা দুটি সন্তানেই সন্তুষ্ট থাকে।

৯. **বিনোদনের ব্যবস্থা:** শহর কিংবা গ্রাম উভয় জায়গাতেই বিনোদনের ব্যবস্থা দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে বিবাহিত জীবনকে বিনোদনের একমাত্র উপায় হিসেবে অনেকে মনে করে। পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের প্রবণতা কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। ফলে জন্মহার স্বাভাবিকভাবেই কমে আসবে।

১০. **নৈতিক চরিত্র গঠন:** নৈতিক চরিত্র উন্নত হলে অসামাজিক কার্যকলাপ দূরীভূত হবে। ফলে অযাচিত সন্তান জন্ম হ্রাস পাবে। এজন্য প্রতিটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই প্রদান করতে হবে যাতে নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হয়।

১১. **নারী ও শিশুদের সুন্দর জীবনবোধ:** শিশু ও নারীদের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে স্বত:স্ফূর্তভাবে পরিকল্পিত জীবনযাপনের দিকে ধাবিত হবে। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে।

১২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা কর্মের দিকে মনোনিবেশ করবে। ফলে তাদের মধ্যে সংসার ছোট রাখার প্রবণতা তৈরি হবে।

১৩. **অভিগমন:** দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কর্মক্ষম এবং বিদেশ যেতে ইচ্ছুক। এরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে জনসংখ্যার চাপ কমবে। একই সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

১৪. **কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন:** দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০ শতাংশ কৃষিতে এবং মাত্র ১৭.৬৪ শতাংশ শিল্পে নিয়োজিত। তাই কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এতে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অধিক সচেতন হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

১৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের একটি অন্যতম উপায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারলে জনসংখ্যার একটি বড় অংশের মনোযোগ সেদিকে থাকবে যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

১৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা:** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আবশ্যক। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যাবতীয় পদক্ষেপ নির্ধারিত সময়ে বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব হবে। এতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল হবে।

১৭. **সচেতনতা সৃষ্টি:** অধিক জনসংখ্যার কুফল এবং চাপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি মানুষের অধিক সন্তান গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। এছাড়াও সামাজিকভাবে নানা ধরনের প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

জনসংখ্যা যে কোনো দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমাদের দেশের আয়তন, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যধিক। ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, উৎপাদনসহ বহুবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্ধিত এই জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যা জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিক্ষা বিস্ড়ার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করা, জনসংখ্যা ও আয়ের সুষম বন্টন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান, নৈতিক চরিত্র দৃঢ়করণ, কর্মমূখি শিক্ষা, গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে জনসংখ্যা বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৬.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব উল্লেখ করন।

২. অধিক জনসংখ্যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কি?

৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাল্য বিবাহ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ভূমিকা উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।